The Financial Express

16 MAY 2026

Locals seek EPZ, embankment as PM goes to Chandpur today

CHANDPUR (BSS): People in Chandpur have raised several key development demands, including the establishment of an Export Processing Zone (EPZ) and a permanent embankment, ahead of the visit of Prime Minister Tarique Rahman to the district today (Saturday).

The Prime Minister is scheduled to arrive here today to inaugurate the re-excavation of two canals and distribute Family Cards.

PM Tarique Rahman

Ahead of the visit, Sheikh Farid Ahmed Manik, President of District BNP and Member of Parliament (MP) from Chandpur-3, presented the local people's expectations during a press briefing held on Friday on the Chandpur Government College campus.

The primary development demands include the establishment of an EPZ on approximately 200 to 250 acres of land, which the locals believe could generate employment for around 150,000 people and significantly boost the economy of Chandpur and neighbouring districts.

In addition, residents have called for the construction of a 60-kilometre permanent embankment along the Meghna River, as well as the continuation of the already approved Economic Zone project aimed at strengthening regional industrial growth.

Sheikh Farid Ahmed Manik said that the Economic Zone project has already been approved and that implementation work will proceed, dismissing what he described as misinformation regarding its status.

According to the officials concerned, the Prime Minister will inaugurate the Khorddo canal re-excavation in the Waruk area under Shahrasti upazila at noon, followed by the inauguration of the Bishwakhal canal re-excavation in the Ghosherhat area of Chandpur Sadar upazila at 1:45pm.

At 3:30 pm, he will distribute Family Cards and address a public gathering at the Chandpur Government College field, and later at 5:30 pm, he will hold an exchange of views with BNP leaders and activists at Chandpur Club.

The briefing was attended by District Parishad Administrator and District BNP General Secretary Advocate Salim Ullah Selim, along with leaders of the Chandpur Press Club and other media representatives.

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

The Financial Express

16 MAY 2026

Govt releases Tk 15b cash incentives for exporters

FE REPORT

The government has released Tk 15 billion in cash incentives for the country's exporters.

It is the fourth tranche of export subsidy for the fiscal year (FY) 2025-26.

The Ministry of Finance (MoF) recently issued an order on the disbursement of the export intensive, which was followed by issuance of a debit authority in favour of the central bank by the Office of the Controller General of Accounts.

The cash incentives will be distributed among eligible exporters through designated banks.

The banks concerned, however, are barred from utilising the funds for any other purposes, according to the ministry's order.

The ministry has also cautioned that legal action will be taken against any banks or exporters found violating the rules and provisions related to the disbursement of the incentives.

The Bangladesh Bank (BB) will provide the necessary funds to the respective banks to facilitate the distribution of the export support among exporters based on their requirements.

The cash incentive programme continues to cover key export oriented sectors, including ready-made garments, frozen shrimp and fish, leather goods, and jute products, as the government had earlier extended the export incentive scheme to 43 sectors for the first half of FY 2025-26, from July 1 to December 31.

According to a BB circular, the rates of the existing cash incentive range from 0.30 per cent to 10 per cent for various categories of exportable goods.

According to the circular, the highest 10 per cent rate of cash incentive has been fixed for exports of vegetables, fruits, and processed agricultural produce, diversified jute products, 'halal' meat and meat products, accumulator batteries, leather products, potato peels, and light- engineering products.

rezamumu@gmail.com

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো
ঢাকা।

সমকাল

16 MAY 2026

জ্বালানি খাতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব আরও বাড়বে

সমকাল প্রতিবেদক

পারস্পরিক বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে তুমুল আলোচনার মধ্যেই বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র জ্বালানি খাতে কৌশলগত সহযোগিতার লক্ষ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সই করেছে। গত বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে সে দেশের জ্বালানি মন্ত্রণালয়ে (ডিওই) এই সমঝোতা স্মারক সই হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে জ্বালানিমন্ত্রী ক্রিস রাইট এবং বাংলাদেশের পক্ষে পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমান স্মারকে সই করেন। ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতাবাসের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। খাত-সংশ্লিষ্টদের মতে, এই সমঝোতা স্মারক বাংলাদেশের জ্বালানি খাতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব আরও বাড়াবে।

দূতাবাসের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সাশ্রয়ী মূল্য ও টেকসই সরবরাহব্যবস্থা নিশ্চিতের মাধ্যমে জ্বালানি সংগ্রহের উৎস বৈচিত্র্যপূর্ণ করার মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি নিরাপত্তা জোরদারের যে প্রচেষ্টা বাংলাদেশের রয়েছে, তাতে ভূমিকা রাখবে এই সমঝোতা স্মারক। পাশাপাশি এটি বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বৃহত্তর জ্বালানি সহযোগিতার নতুন ক্ষেত্র উন্মোচন করবে।

এই স্মারকের আওতায় দুই দেশের মধ্যে তেল, গ্যাস, ভূতাপীয় ও জৈবশক্তি বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি, জ্ঞান ও দক্ষতা বিনিময় এবং গবেষণা সহজ হবে। সেই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র থেকে সাশ্রয়ী মূল্যে এলএনজি, এলপিজি ও অন্যান্য জ্বালানি পণ্য বাংলাদেশের আমদানির ক্ষেত্রে এটা সহায়ক হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এই সমঝোতা স্মারককে ক্রমবর্ধমান বাংলাদেশ-মার্কিন সম্পর্কের আরেকটি মাইলফলক হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি এই উদ্যোগের প্রতি সমর্থনের জন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ধন্যবাদ জানান।

ঢাকা-ওয়াশিংটন সমঝোতা স্মারক সই

- মার্কিন এলএনজি সরবরাহ বাড়ানোর বিষয়ে গুরুত্ব
- জ্বালানি খাতে চীন-রাশিয়ার প্রভাব তুলনামূলকভাবে কমতে পারে

যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানিমন্ত্রী ক্রিস রাইট সমঝোতা স্মারককে বাংলাদেশ-মার্কিন সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক অগ্রগতি হিসেবে উল্লেখ করেন।

জানতে চাইলে জ্বালানি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ইজাজ হোসেন গতকাল শুক্রবার রাতে সমকালকে বলেন, মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের কারণে বাংলাদেশ জ্বালানি নিয়ে যে সংকটে পড়েছে তার সমাধানের জন্য উৎসের বৈচিত্র্য প্রয়োজন। তাই যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক এই বিষয়ে সহযোগিতা করবে। কারণ, সেখানে এলএনজি অনেক সস্তা। এ ছাড়া আধুনিক জ্বালানি প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিত হতেও এই স্মারক ভূমিকা রাখবে। তবে এর শর্ত যদি এমন হয়, বাংলাদেশ মানতে বাধ্য হবে, তাহলে তা দেশের সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ।

এর আগে গত ৯ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি পারস্পরিক বাণিজ্য চুক্তি (অ্যাগ্রিমেন্ট অন রিসিপ্রোক্যাল ট্রেড বা এআরটি) সই হয়। অন্তর্বর্তী সরকারের শেষ সময়ে স্বাক্ষরিত ৩২ পৃষ্ঠার এই চুক্তির বিভিন্ন শর্ত ও বিধিমালা নিয়ে চলছে তুমুল বিতর্ক। রাজনীতিবিদ ও অর্থনীতিবিদদের মতে, এই চুক্তির অনেক বিধি বাংলাদেশ মানতে বাধ্য, যা বাংলাদেশের বাজারে যুক্তরাষ্ট্রের পণ্যের জন্য বাড়তি সুবিধা তৈরি করবে।

চুক্তিতে যুক্তরাষ্ট্র থেকে দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি পণ্য

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

আমদানির প্রতিশ্রুতি রয়েছে। এর আওতায় বাংলাদেশ আগামী ১৫ বছরে প্রায় ১৫ বিলিয়ন ডলারের মার্কিন জ্বালানি পণ্য আমদানি করবে। এর মধ্যে এলএনজি, এলপিজি এবং অন্যান্য জ্বালানি রয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার সই করা সমঝোতা স্মারকে মার্কিন এলএনজি সরবরাহ বাড়ানোর বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের লুইজিয়ানাভিত্তিক একটি এলএনজি কোম্পানির সঙ্গে বাংলাদেশে দীর্ঘমেয়াদি গ্যাস সরবরাহ আলোচনা হয়েছে।

স্মারকে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের এক্সিম ব্যাংক ও ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স করপোরেশন (ডিএফসি) বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ খাতে বিনিয়োগ অর্থায়নের বিষয় বিবেচনা করবে। এতে জ্বালানি অবকাঠামো, এলএনজি টার্মিনাল, বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্পে মার্কিন অর্থায়নের পথ এতে উন্মুক্ত হচ্ছে।

বিশ্লেষকদের মতে, এর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র শুধু বাণিজ্য নয়, বাংলাদেশের জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থায়ও প্রভাব বাড়াতে চাচ্ছে। বিশেষ করে এলএনজি আমদানি, অবকাঠামো বিনিয়োগ এবং জ্বালানি প্রযুক্তিতে মার্কিন উপস্থিতি বাড়লে বাংলাদেশের জ্বালানি খাতে চীন ও রাশিয়ার প্রভাব তুলনামূলকভাবে কমতে পারে।

জ্বালানি বিশেষজ্ঞদের মতে, নতুন সমঝোতা স্মারক বাংলাদেশের জন্য একদিকে নতুন বিনিয়োগ ও জ্বালানি সরবরাহের সুযোগ তৈরি করছে, অন্যদিকে আমদানিনির্ভরতা ও দীর্ঘমেয়াদি ব্যয়ের

...রন। প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে বিবিয়ানা, জালালাবাদ ও মৌলভীবাজার গ্যাসক্ষেত্র পরিচালনা করছে। দেশের মোট প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রায় অর্ধেকই আসে এই তিন গ্যাসক্ষেত্র থেকে। গ্যাস সংকট তীব্র হওয়ার পর বাংলাদেশ এলএনজি আমদানির দিকে ঝুঁকে পড়ে। এই খাতে সবচেয়ে বড় মার্কিন অংশীদার এক্সিলারেট এনার্জি। প্রতিষ্ঠানটি মহেশখালী দ্বীপের কাছে বাংলাদেশের প্রথম ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল (এফএসআরইউ) নির্মাণ ও পরিচালনা করছে। অন্য এফএসআরইউটিও এক্সিলারেটের, যা সামিট গ্রুপ ভাড়ায় চলাচ্ছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রযুক্তিতে বড় ভূমিকা রাখছে মার্কিন বহুজাতিক জেনারেল ইলেকট্রনিক্স। বাংলাদেশের একাধিক বড় গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে জেনারেল ইলেকট্রনিক্সের উচ্চ দক্ষতার গ্যাস টারবাইন ব্যবহার করা হয়েছে। মেঘনাঘাট ৫৮৪ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎকেন্দ্রে জেনারেলের প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়েছে। এ ছাড়া সামিট গ্রুপ ও অন্যান্য বেসরকারি বিদ্যুৎ প্রকল্পেও জেনারেল গ্যাস টারবাইন ও সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি সরবরাহ করেছে।

বাংলাদেশে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে মার্কিন বিনিয়োগের আরেকটি বড় ক্ষেত্র হচ্ছে নবায়নযোগ্য জ্বালানি। মার্কিন কোম্পানি ও বিনিয়োগ তহবিলগুলো এখন বড় আকারের সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পে আগ্রহ দেখাচ্ছে। বিশেষ করে ব্যাটারি স্টোরেজ প্রযুক্তি, স্মার্ট গ্রিড এবং সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনায় যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে আলোচনা চলছে। এ ছাড়া মার্কিন উন্নয়ন সংস্থা ইউএসএআইডি দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ ও

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র

জ্বালানি মন্ত্রণালয়ে (ডিওই) এই সমঝোতা স্মারক সই হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে জ্বালানিমন্ত্রী ক্রিস রাইট এবং বাংলাদেশের পক্ষে পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমান স্মারকে সই করেন। ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতাবাসের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। খাত-সংশ্লিষ্টদের মতে, এই সমঝোতা স্মারক বাংলাদেশের জ্বালানি খাতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব আরও বাড়াবে।

দূতাবাসের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সাশ্রয়ী মূল্য ও টেকসই সরবরাহব্যবস্থা নিশ্চিতের মাধ্যমে জ্বালানি সংগ্রহের উৎস বৈচিত্র্যপূর্ণ করার মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি নিরাপত্তা জোরদারের যে প্রচেষ্টা বাংলাদেশের রয়েছে, তাতে ভূমিকা রাখবে এই সমঝোতা স্মারক। পাশাপাশি এটি বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বৃহত্তর জ্বালানি সহযোগিতার নতুন ক্ষেত্র উন্মোচন করবে।

এই স্মারকের আওতায় দুই দেশের মধ্যে তেল, গ্যাস, ভূতাপীয় ও জৈবশক্তি বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি, জ্ঞান ও দক্ষতা বিনিময় এবং গবেষণা সহজ হবে। সেই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র থেকে সাশ্রয়ী মূল্যে এলএনজি, এলপিজি ও অন্যান্য জ্বালানি পণ্য বাংলাদেশের আমদানির ক্ষেত্রে এটা সহায়ক হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এই সমঝোতা স্মারককে ক্রমবর্ধমান বাংলাদেশ-মার্কিন সম্পর্কের আরেকটি মাইলফলক হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি এই উদ্যোগের প্রতি সমর্থনের জন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ধন্যবাদ জানান।

বাড়ানোর বিষয়ে গুরুত্ব

জ্বালানি খাতে চীন-রাশিয়ার প্রভাব তুলনামূলকভাবে কমতে পারে

যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানিমন্ত্রী ক্রিস রাইট সমঝোতা স্মারককে বাংলাদেশ-মার্কিন সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক অগ্রগতি হিসেবে উল্লেখ করেন।

জানতে চাইলে জ্বালানি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ইজাজ হোসেন গতকাল শুক্রবার রাতে সমকালকে বলেন, মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের কারণে বাংলাদেশ জ্বালানি নিয়ে যে সংকটে পড়েছে তার সমাধানের জন্য উৎসের বৈচিত্র্য প্রয়োজন। তাই যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক এই বিষয়ে সহযোগিতা করবে। কারণ, সেখানে এলএনজি অনেক সস্তা। এ ছাড়া আধুনিক জ্বালানি প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিত হতেও এই স্মারক ভূমিকা রাখবে। তবে এর শর্ত যদি এমন হয়, বাংলাদেশ মানতে বাধ্য হবে, তাহলে তা দেশের সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ।

এর আগে গত ৯ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি পারস্পরিক বাণিজ্য চুক্তি (অ্যাগ্রিমেন্ট অন রিসিপ্রোক্যাল ট্রেড বা এআরটি) সই হয়। অন্তর্বর্তী সরকারের শেষ সময়ে স্বাক্ষরিত ৩২ পৃষ্ঠার এই চুক্তির বিভিন্ন শর্ত ও বিধিমালা নিয়ে চলছে তুমুল বিতর্ক। রাজনীতিবিদ ও অর্থনীতিবিদদের মতে, এই চুক্তির অনেক বিধি বাংলাদেশ মানতে বাধ্য, যা বাংলাদেশের বাজারে যুক্তরাষ্ট্রের পণ্যের জন্য বাড়তি সুবিধা তৈরি করবে।

চুক্তিতে যুক্তরাষ্ট্র থেকে দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি পণ্য

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

আমদানির প্রতিশ্রুতি রয়েছে। এর আওতায় বাংলাদেশ আগামী ১৫ বছরে প্রায় ১৫ বিলিয়ন ডলারের মার্কিন জ্বালানি পণ্য আমদানি করবে। এর মধ্যে এলএনজি, এলপিজি এবং অন্যান্য জ্বালানি রয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার সই করা সমঝোতা স্মারকে মার্কিন এলএনজি সরবরাহ বাড়ানোর বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের লুইজিয়ানাভিত্তিক একটি এলএনজি কোম্পানির সঙ্গে বাংলাদেশে দীর্ঘমেয়াদি গ্যাস সরবরাহ আলোচনা হয়েছে।

স্মারকে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের এক্সিম ব্যাংক ও ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স করপোরেশন (ডিএফসি) বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ খাতে বিনিয়োগ অর্থায়নের বিষয় বিবেচনা করবে। এতে জ্বালানি অবকাঠামো, এলএনজি টার্মিনাল, বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্পে মার্কিন অর্থায়নের পথ এতে উন্মুক্ত হচ্ছে।

বিশ্লেষকদের মতে, এর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র শুধু বাণিজ্য নয়, বাংলাদেশের জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থায়ও প্রভাব বাড়াতে চাচ্ছে। বিশেষ করে এলএনজি আমদানি, অবকাঠামো বিনিয়োগ এবং জ্বালানি প্রযুক্তিতে মার্কিন উপস্থিতি বাড়লে বাংলাদেশের জ্বালানি খাতে চীন ও রাশিয়ার প্রভাব তুলনামূলকভাবে কমতে পারে।

জ্বালানি বিশেষজ্ঞদের মতে, নতুন সমঝোতা স্মারক বাংলাদেশের জন্য একদিকে নতুন বিনিয়োগ ও জ্বালানি সরবরাহের সুযোগ তৈরি করছে, অন্যদিকে আমদানিনির্ভরতা ও দীর্ঘমেয়াদি ব্যয়ের চাপও বাড়াতে পারে।

দেশের জ্বালানি খাতে যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানিগুলোর উপস্থিতি এখন শুধু গ্যাস অনুসন্ধান বা বিদ্যুৎকেন্দ্রে সীমাবদ্ধ নেই। এলএনজি আমদানি, ভাসমান টার্মিনাল, উচ্চ দক্ষতার গ্যাস টারবাইন, সৌরবিদ্যুৎ, বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থা আধুনিকায়ন থেকে শুরু করে জ্বালানি নীতি সহায়তা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে মার্কিন সম্পৃক্ততা।

বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় ও দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান হলো শেভরন। প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে বিবিয়ানা, জালালাবাদ ও মৌলভীবাজার গ্যাসক্ষেত্র পরিচালনা করছে। দেশের মোট প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রায় অর্ধেকই আসে এই তিন গ্যাসক্ষেত্র থেকে। গ্যাস সংকট তীব্র হওয়ার পর বাংলাদেশ এলএনজি আমদানির দিকে ঝুঁকে পড়ে। এই খাতে সবচেয়ে বড় মার্কিন অংশীদার এক্সিলারেট এনার্জি। প্রতিষ্ঠানটি মহেশখালী দ্বীপের কাছে বাংলাদেশের প্রথম ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল (এফএসআরইউ) নির্মাণ ও পরিচালনা করছে। অন্য এফএসআরইউটিও এক্সিলারেটের, যা সামিট গ্রুপ ভাড়ায় চলাচ্ছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রযুক্তিতে বড় ভূমিকা রাখছে মার্কিন বহুজাতিক জেনারেল ইলেকট্রনিক্স। বাংলাদেশের একাধিক বড় গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে জেনারেল ইলেকট্রনিক্সের উচ্চ দক্ষতার গ্যাস টারবাইন ব্যবহার করা হয়েছে। মেঘনাঘাট ৫৮৪ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎকেন্দ্রে জেনারেলের প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়েছে। এ ছাড়া সামিট গ্রুপ ও অন্যান্য বেসরকারি বিদ্যুৎ প্রকল্পেও জেনারেল গ্যাস টারবাইন ও সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি সরবরাহ করেছে।

বাংলাদেশে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে মার্কিন বিনিয়োগের আরেকটি বড় ক্ষেত্র হচ্ছে নবায়নযোগ্য জ্বালানি। মার্কিন কোম্পানি ও বিনিয়োগ তহবিলগুলো এখন বড় আকারের সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পে আগ্রহ দেখাচ্ছে। বিশেষ করে ব্যাটারি স্টোরেজ প্রযুক্তি, স্মার্ট গ্রিড এবং সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনায় যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে আলোচনা চলছে। এ ছাড়া মার্কিন উন্নয়ন সংস্থা ইউএসএইড দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে নীতি সহায়তা দিয়ে আসছে। বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি, বিদ্যুৎ অপচয় কমানো, স্মার্ট মিটারিং, নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতি প্রণয়ন এবং বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার বিভিন্ন প্রকল্পে সংস্থাটি কাজ করছে।

যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও ভারত, নেপাল, মালয়েশিয়া, জাপান, রাশিয়া, কাতার, ওমানসহ বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি-সংক্রান্ত চুক্তি সই করেছে।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।

বণিক বার্তা
16 MAY 2026

ভুল বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বাড়ছে প্লাস্টিক রিসাইকেল ব্যয়

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

দেশে ৪৫ হাজার কোটি টাকার প্লাস্টিক পণ্যের বাজারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বড় হচ্ছে রিসাইকেল প্লাস্টিকের বাজারও। তবে ভুল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আর নীতিসহায়তার অভাবে বাড়তি উৎপাদন খরচ ,উদীয়মান খাতটির বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্লাস্টিক বর্জ্য সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রিসাইকেল করতে না পারলে তা পরিবেশ ও মানব স্বাস্থ্যের জন্য চরম হুমকি হয়ে দেখা দেবে। উন্নত বিশ্বে প্লাস্টিক রিসাইক্লিংয়ের জন্য সরকার বিশেষ প্রণোদনা দেয়। পাশাপাশি ক্রেতারাও সাধারণ প্লাস্টিক পণ্যের তুলনায় পুনর্ব্যবহৃত প্লাস্টিক পণ্যের জন্য তুলনামূলক বেশি মূল্য পরিশোধ করেন। তবে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে চিত্রটি ভিন্ন। রিসাইকেল প্লাস্টিক পণ্য বেশি দামে তো দূরের কথা তুলনামূলক কম দামে বিক্রি করতে হয় বলে জানান এ খাতের শীর্ষ ব্যবসায়ীরা।

ঢাকা, চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন শহরে বর্তমানে প্রায় পাঁচ হাজারের বেশি ছোট-বড় প্লাস্টিক রিসাইকেল কারখানা রয়েছে। বাসা-বাড়ি, রাস্তা-ঘাট ও ভাগাড় থেকে কুড়িয়ে প্লাস্টিক আনা হয় কারখানায়। তারপর সে প্লাস্টিক বিভিন্ন মেশিনে ভেঙে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় পরিণত করা হয়। সে কণা দিয়ে পরবর্তী সময়ে চেয়ার, টেবিল, ওয়্যারড্রব, ফুল ও ফুলের টব বানানো হয়।

দেশের সবচেয়ে বড় প্লাস্টিক রিসাইকেল করা প্রতিষ্ঠানটির নাম প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ। ২০১২ সাল থেকে প্লাস্টিক রিসাইকেল কার্যক্রম শুরু করে প্রতিষ্ঠানটি। হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জে প্রায় ১ হাজার ১০০ বিঘা জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত তাদের বৃহৎ শিল্পপার্কে উৎপাদিত হয় বিভিন্ন ধরনের পণ্য। এখানেই গড়ে উঠেছে দেশের সর্ববৃহৎ ও অত্যাধুনিক প্লাস্টিক রিসাইক্লিং প্লান্ট, যেখানে সারা দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ করা প্লাস্টিক বর্জ্য নতুন আকারে ব্যবহার উপযোগী হয়ে ফিরে আসে।

রিসাইকেল প্লাস্টিক পণ্যের জন্য 'টেল প্লাস্টিকস' নামে পৃথক একটি ব্র্যান্ড দাঁড় করিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। সম্প্রতি হবিগঞ্জের প্লাস্টিক রিসাইকেল কারখানাটি পরিদর্শন করে দেখা যায়, প্লাস্টিক রিসাইকেল করে শতাধিক পণ্য বাজারজাত করছে 'টেল প্লাস্টিকস'র মাধ্যমে।

ঢাকা-চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন শহরে পাঁচ হাজারের বেশি ছোট-বড় প্লাস্টিক রিসাইকেল কারখানা রয়েছে। ভুল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আর নীতিসহায়তার অভাবে বাড়তি উৎপাদন খরচ উদীয়মান খাতটির জন্য বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা। বিশেষজ্ঞদের মতে প্লাস্টিক বর্জ্য সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রিসাইকেল করতে না পারলে তা পরিবেশ ও মানব স্বাস্থ্যের জন্য হুমকি হয়ে দেখা দেবে

কারখানার কর্মীরা প্লাস্টিকের ভাঙা অংশ, বোতল ও পলিথিন বর্জ্য একটি বিশাল মেশিনের ধাতব প্লেটে তুলে দিচ্ছেন। মুহূর্তের মধ্যেই সেগুলো চূর্ণ হয়ে ছোট ছোট দানায় পরিণত হচ্ছে। অন্য পাশ দিয়ে বেরিয়ে আসছে প্লাস্টিকের কুচি। পরে সেই কুচি ধোয়া, শুকানো, গলানো ও পরিশোধনের একাধিক ধাপ পেরিয়ে তৈরি হচ্ছে রেজিন। অর্থাৎ প্লাস্টিক তৈরির মূল কাঁচামাল। সেই রেজিন দিয়ে তৈরি হচ্ছে চেয়ার, বালতি, ফুলের টব, ডাস্টবিন, পোলট্রি সামগ্রী, বেলচা, গার্ডেনিং পণ্যসহ শতাধিক সামগ্রী।

টেল প্লাস্টিকসের নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ কামরুল হাসান বলেন, 'প্লাস্টিক পণ্য উৎপাদন থেকে শুরু করে বিতরণ, বিক্রয়, ভোক্তার ব্যবহার এবং পরবর্তী সময়ে বর্জ্য সংগ্রহ ও রিসাইকেল প্লান্টে প্রক্রিয়াজাত করে পুনর্ব্যবহারের মাধ্যমে নতুন পণ্য সৃষ্টি ও বাজারজাত করা হয়। এভাবে প্লাস্টিক বর্জ্য আবর্জনা না হয়ে মূল্যবান সম্পদে রূপান্তরিত হয়।' তিনি জানান, বর্তমানে আরএফএল গ্রুপ প্রতি মাসে প্রায় ৫ হাজার ৭৫০ টন প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহারযোগ্য করে তোলে, যা বছরে প্রায় ৬৯ হাজার টনে পৌঁছায়। এ বিপুল পরিমাণ প্লাস্টিক তৈরির কাঁচামাল আমদানি করতে গেলে ৪০০ কোটি টাকার বেশি বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হতো। এভাবে রিসাইক্লিং কার্যক্রম শুধু পরিবেশ সুরক্ষায় নয়, অর্থনৈতিক সাশ্রয়েও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

পাশাপাশি ল্যান্ডফিলের ব্যবহারও কমায়।

প্লাস্টিক রিসাইকেলের ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে ভুল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা। সরকারের ভুল নীতির কারণে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রাথমিক শর্তই পূরণ হচ্ছে না বলে মন্তব্য করেছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ফাহমিদা পারভীন। বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, 'বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বলতে সিটি করপোরেশন এবং পৌরসভাগুলো মনে করে বাসা থেকে বর্জ্য গাড়ি দিয়ে নিয়ে এসে ল্যান্ডফিলে ফেলা। কিন্তু বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কিন্তু এটা নয়। বাসাবাড়ি, দোকানপাট যেখানে বর্জ্য উৎপাদন হয়, সেখান থেকেই বর্জ্য আলাদা করে ফেলতে হবে। শুকনো বর্জ্য, ভেজা বর্জ্য। তারপর আলাদা গাড়িতে আলাদা জায়গায় বর্জ্য নিয়ে যাওয়া হবে। প্লাস্টিক বর্জ্য সরকার নিজে রিসাইকেল করবে বা অন্য কোম্পানি করবে। এভাবে বর্জ্যকে শক্তিতে রূপান্তর করার পুরো প্রক্রিয়াকেই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বলা হয়, যা আমাদের দেশে হচ্ছে না।'

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ভুল পথে হাঁটার কারণে প্লাস্টিক রিসাইকেল ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেন টেল প্লাস্টিকসের নির্বাহী পরিচালক কামরুল হাসান। বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, 'রিসাইকেলের ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ হলো দূষিত বা ময়লা প্লাস্টিক। দেখা গেছে, যে প্লাস্টিক আসে সেটা ময়লার ভাগাড় থেকে নয়তো খাল বা নদী

বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় চার হাজার প্লাস্টিক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এ খাতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত প্রায় ২০ লাখ মানুষ। দেশে প্রতি বছর প্লাস্টিক ব্যবহারের পরিমাণ প্রায় ২৪ লাখ টন। মাথাপিছু ব্যবহারের পরিমাণ বছরে প্রায় ১৫ কেজি। যদিও উন্নত দেশগুলোর তুলনায় এটি এখনো কম। বিশ্বে গড়ে মাথাপিছু প্লাস্টিক ব্যবহার প্রায় ৬০ কেজি। উত্তর আমেরিকা, পশ্চিম ইউরোপ ও জাপানের মতো অঞ্চলে এটি ১০০ কেজিরও বেশি। বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশের অর্থনীতি ও নগরায়ণ যত বাড়বে, প্লাস্টিকের ব্যবহারও তত বাড়বে। তাই এখনই কার্যকর রিসাইক্লিং অবকাঠামো গড়ে না তুললে ভবিষ্যতে বর্জ্য সংকট আরো ভয়াবহ আকার নিতে পারে।

স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটির পরিবেশবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. আহমদ কামরুজ্জামান মজুমদার বণিক বার্তাকে বলেন, 'প্লাস্টিকের কাঁচামাল সহজে পচনশীল নয় বলেই এটি পরিবেশ দূষণের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে সঠিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে পারলে এ দূষণ অনেকাংশে কমানো সম্ভব। প্লাস্টিকের সঠিক সংগ্রহ ও পুনর্ব্যবহারের দায়িত্ব শুধু সরকারের নয়; উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকেও বড় ভূমিকা নিতে হবে।'

সস্তা ও সহজলভ্য হওয়ায় প্লাস্টিকের ব্যবহার দ্রুত বাড়ছে। কিন্তু এর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা দুর্বল অবস্থায়

আর নীতিসহায়তার অভাবে বাড়তি উৎপাদন খরচ উদীয়মান খাতটির বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্লাস্টিক বর্জ্য সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রিসাইকেল করতে না পারলে তা পরিবেশ ও মানব স্বাস্থ্যের জন্য চরম হুমকি হয়ে দেখা দেবে। উন্নত বিশ্বে প্লাস্টিক রিসাইক্লিংয়ের জন্য সরকার বিশেষ প্রণোদনা দেয়। পাশাপাশি ক্রেতারাও সাধারণ প্লাস্টিক পণ্যের তুলনায় পুনর্ব্যবহৃত প্লাস্টিক পণ্যের জন্য তুলনামূলক বেশি মূল্য পরিশোধ করেন। তবে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে চিত্রটি ভিন্ন। রিসাইকেল প্লাস্টিক পণ্য বেশি দামে তো দূরের কথা তুলনামূলক কম দামে বিক্রি করতে হয় বলে জানান এ খাতের শীর্ষ ব্যবসায়ীরা।

ঢাকা, চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন শহরে বর্তমানে প্রায় পাঁচ হাজারের বেশি ছোট-বড় প্লাস্টিক রিসাইকেল কারখানা রয়েছে। বাসা-বাড়ি, রাস্তা-ঘাট ও ভাগাড় থেকে কুড়িয়ে প্লাস্টিক আনা হয় কারখানায়। তারপর সে প্লাস্টিক বিভিন্ন মেশিনে ভেঙে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় পরিণত করা হয়। সে কণা দিয়ে পরবর্তী সময়ে চেয়ার, টেবিল, ওয়্যারড্রব, ফুল ও ফুলের টব বানানো হয়।

দেশের সবচেয়ে বড় প্লাস্টিক রিসাইকেল করা প্রতিষ্ঠানটির নাম প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ। ২০১২ সাল থেকে প্লাস্টিক রিসাইকেল কার্যক্রম শুরু করে প্রতিষ্ঠানটি। হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জে প্রায় ১ হাজার ১০০ বিঘা জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত তাদের বৃহৎ শিল্পপার্কে উৎপাদিত হয় বিভিন্ন ধরনের পণ্য। এখানেই গড়ে উঠেছে দেশের সর্ববৃহৎ ও অত্যাধুনিক প্লাস্টিক রিসাইক্লিং প্লান্ট, যেখানে সারা দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ করা প্লাস্টিক বর্জ্য নতুন আকারে ব্যবহার উপযোগী হয়ে ফিরে আসে।

রিসাইকেল প্লাস্টিক পণ্যের জন্য 'টেল প্লাস্টিকস' নামে পৃথক একটি ব্র্যান্ড দাঁড় করিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। সম্প্রতি হবিগঞ্জের প্লাস্টিক রিসাইকেল কারখানাটি পরিদর্শন করে দেখা যায়, প্লাস্টিক রিসাইকেল করে শতাধিক পণ্য বাজারজাত করছে 'টেল প্লাস্টিকস'র মাধ্যমে।

ঢাকা-চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন শহরে পাঁচ হাজারের বেশি ছোট-বড় প্লাস্টিক রিসাইকেল কারখানা রয়েছে। ভুল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আর নীতিসহায়তার অভাবে বাড়তি উৎপাদন খরচ উদীয়মান খাতটির জন্য বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা। বিশেষজ্ঞদের মতে প্লাস্টিক বর্জ্য সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রিসাইকেল করতে না পারলে তা পরিবেশ ও মানব স্বাস্থ্যের জন্য হুমকি হয়ে দেখা দেবে

কারখানার কর্মীরা প্লাস্টিকের ভাঙা অংশ, বোতল ও পলিথিন বর্জ্য একটি বিশাল মেশিনের ধাতব প্লেটে তুলে দিচ্ছেন। মুহূর্তের মধ্যেই সেগুলো চূর্ণ হয়ে ছোট ছোট দানায় পরিণত হচ্ছে। অন্য পাশ দিয়ে বেরিয়ে আসছে প্লাস্টিকের কুচি। পরে সেই কুচি ধোয়া, শুকানো, গলানো ও পরিশোধনের একাধিক ধাপ পেরিয়ে তৈরি হচ্ছে রেজিন। অর্থাৎ প্লাস্টিক তৈরির মূল কাঁচামাল। সেই রেজিন দিয়ে তৈরি হচ্ছে চেয়ার, বালতি, ফুলের টব, ডাস্টবিন, পোলট্রি সামগ্রী, বেলচা, গার্ডেনিং পণ্যসহ শতাধিক সামগ্রী।

টেল প্লাস্টিকসের নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ কামরুল হাসান বলেন, 'প্লাস্টিক পণ্য উৎপাদন থেকে শুরু করে বিতরণ, বিক্রয়, ভোক্তার ব্যবহার এবং পরবর্তী সময়ে বর্জ্য সংগ্রহ ও রিসাইকেল প্লান্টে প্রক্রিয়াজাত করে পুনর্ব্যবহারের মাধ্যমে নতুন পণ্য সৃষ্টি ও বাজারজাত করা হয়। এভাবে প্লাস্টিক বর্জ্য আবর্জনা না হয়ে মূল্যবান সম্পদে রূপান্তরিত হয়।' তিনি জানান, বর্তমানে আরএফএল গ্রুপ প্রতি মাসে প্রায় ৫ হাজার ৭৫০ টন প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহারযোগ্য করে তোলে, যা বছরে প্রায় ৬৯ হাজার টনে পৌঁছায়। এ বিপুল পরিমাণ প্লাস্টিক তৈরির কাঁচামাল আমদানি করতে গেলে ৪০০ কোটি টাকার বেশি বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হতো। এভাবে রিসাইক্লিং কার্যক্রম শুধু পরিবেশ সুরক্ষায় নয়, অর্থনৈতিক সাশ্রয়েও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহার শুধু অর্থনৈতিক মূল্যই তৈরি করে না, পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষাতেও ভূমিকা রাখে। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, এক কেজি পুনর্ব্যবহৃত প্লাস্টিক প্রায় ১ দশমিক ৮ কেজি কার্বন নিঃসরণ কমায়। একই সঙ্গে প্রতি টন পুনর্ব্যবহৃত প্লাস্টিক প্রায় ৮১০ ঘনমিটার ল্যান্ডফিল রক্ষা করে। এ হিসেবে প্লাস্টিক রিসাইকেলের মাধ্যমে কার্বন নিঃসরণের পাশাপাশি ল্যান্ডফিলের ব্যবহারও কমায়।

প্লাস্টিক রিসাইকেলের ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে ভুল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা। সরকারের ভুল নীতির কারণে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রাথমিক শর্তই পূরণ হচ্ছে না বলে মন্তব্য করেছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ফাহমিদা পারভীন। বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, 'বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বলতে সিটি করপোরেশন এবং পৌরসভাগুলো মনে করে বাসা থেকে বর্জ্য গাড়ি দিয়ে নিয়ে এসে ল্যান্ডফিলে ফেলা। কিন্তু বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কিন্তু এটা নয়। বাসাবাড়ি, দোকানপাট যেখানে বর্জ্য উৎপাদন হয়, সেখান থেকেই বর্জ্য আলাদা করে ফেলতে হবে। শুকনো বর্জ্য, ভেজা বর্জ্য। তারপর আলাদা গাড়িতে আলাদা জায়গায় বর্জ্য নিয়ে যাওয়া হবে। প্লাস্টিক বর্জ্য সরকার নিজে রিসাইকেল করবে বা অন্য কোম্পানি করবে। এভাবে বর্জ্যকে শক্তিতে রূপান্তর করার পুরো প্রক্রিয়াকেই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বলা হয়, যা আমাদের দেশে হচ্ছে না।'

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ভুল পথে হাঁটার কারণে প্লাস্টিক রিসাইকেল ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেন টেল প্লাস্টিকসের নির্বাহী পরিচালক কামরুল হাসান। বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, 'রিসাইকেলের ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ হলো দূষিত বা ময়লা প্লাস্টিক। দেখা গেছে, যে প্লাস্টিক আসে সেটা ময়লার ভাগাড় থেকে নয়তো খাল বা নদী থেকে আসে। এগুলোর সঙ্গে ভালো প্লাস্টিকও মিলে যায়। তখন প্লাস্টিকগুলো পরিষ্কার করতে আলাদা লোকবল, শ্রম ও ব্যয় বেড়ে যায়। শুধু তা-ই নয়, এতে করে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি পানি ব্যবহার করতে হয়। আবার বেশি পানির জন্য বেশি ব্যয় হয়। সে পানি ট্রিটমেন্ট করতেও ব্যয় হয়। সরকার যদি সোর্স থেকেই বর্জ্য পৃথক করার নীতি বাস্তবায়ন করতে পারত তাহলে রিসাইকেল শিল্প আরো দ্রুত এগিয়ে যেত।'

বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় চার হাজার প্লাস্টিক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এ খাতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত প্রায় ২০ লাখ মানুষ। দেশে প্রতি বছর প্লাস্টিক ব্যবহারের পরিমাণ প্রায় ২৪ লাখ টন। মাথাপিছু ব্যবহারের পরিমাণ বছরে প্রায় ১৫ কেজি। যদিও উন্নত দেশগুলোর তুলনায় এটি এখনো কম। বিশ্বে গড়ে মাথাপিছু প্লাস্টিক ব্যবহার প্রায় ৬০ কেজি। উত্তর আমেরিকা, পশ্চিম ইউরোপ ও জাপানের মতো অঞ্চলে এটি ১০০ কেজিরও বেশি। বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশের অর্থনীতি ও নগরায়ণ যত বাড়বে, প্লাস্টিকের ব্যবহারও তত বাড়বে। তাই এখনই কার্যকর রিসাইক্লিং অবকাঠামো গড়ে না তুললে ভবিষ্যতে বর্জ্য সংকট আরো ভয়াবহ আকার নিতে পারে।

স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটির পরিবেশবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. আহমদ কামরুজ্জামান মজুমদার বণিক বার্তাকে বলেন, 'প্লাস্টিকের কাঁচামাল সহজে পচনশীল নয় বলেই এটি পরিবেশ দূষণের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে সঠিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে পারলে এ দূষণ অনেকাংশে কমানো সম্ভব। প্লাস্টিকের সঠিক সংগ্রহ ও পুনর্ব্যবহারের দায়িত্ব শুধু সরকারের নয়; উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকেও বড় ভূমিকা নিতে হবে।' সস্তা ও সহজলভ্য হওয়ায় প্লাস্টিকের ব্যবহার দ্রুত বাড়ছে। কিন্তু এর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা দুর্বল হওয়ায় পরিবেশগত ঝুঁকিও বাড়ছে বলে মনে করেন পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো. লুৎফর রহমান। তিনি বণিক বার্তাকে বলেন, 'প্লাস্টিক বর্জ্য নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে কার্যকর উপায়গুলোর একটি হলো পুনর্ব্যবহার। সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সঠিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা গেলে পরিবেশ বিপর্যয় অনেকটাই কমানো সম্ভব। আমরা উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলোকে রিসাইক্লিং বাড়াতে সচেতন করছি।'